একটি গল্প, যদি প্রসঙ্গ ও প্রকরণ শাস্ত্রসম্মত হয়

অধ্যাপক খালেদ হোসাইন (বাংলাদেশ থেকে)

১. চারটা বিশ অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে

যখন জানতে পারলাম কাছেই এমন একটা কবরস্থান আছে, যার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই গা ছমছম করে ওঠে, আমরা সকলেই তখন চাইলাম, আমাদের গা ছমছম করে উঠুক। কারণ কোনোকিছুতেই আজকাল আমাদের গা ছমছম করে ওঠে না। তাই অনেক পথের বাঁক পেরিয়ে গাছপালার টানেলের ভেতর দিয়ে প্রায় মুছে-যাওয়া একটি পায়ে-চলা পথ ধরে পাঁচিল-ঘেরা পুরনো কবরস্থানের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই আমাদের সকলের মোবাইল এক সঙ্গে বেজে ওঠল। এই ঘটনাটিকে মোটেও অতিলৌকিক বলা যাবে না। নিতান্তই কো-ইন্সিডেন্স। এমনটি ঘটতেই পারে। ঘটেও। তবু ছমছম করে উঠল সমস্ত শরীর। যথারীতি শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল অনুভূতি প্রবাহিত হল। আমরা ভেবে নিলাম, মনে মনে আমাদের ভয় পাওয়ার জন্য যে আকুতি ছিল, এ তারই ফল। কিন্তু এরপর তালগাছের পাতায় পাতায় ঝুলে–থাকা কালো কালো বাদুড়গুলো একসঙ্গে খসে পড়ল ধুপ ধাপ - গোরস্থানের পশ্চিম দেওয়াল ঘেষে।

রায়হান রাইন মোবাইলের মনিটরে তাকিয়ে বলল, 'অচেনা হরফ। আরবী নাকি ? না, অনেকটা চাইনিজ টাইপের। মনে হয় কোনো কবি-বন্ধু।'

বলেই একটু দূরে সরে গেল, কেননা ওর ধারণা দুজন কবি যখন কথা বলে, অন্যের তা শোনা অনুচিৎ। অথবা কোনো মেয়ে-বন্ধুও হতে পারে।

আমাদের মোবাইলের রিং-টোন বেজে চলছিল, রিসিভ না করে আমরা ফোন অফ করে রাখলাম। কারণ, আমরা চাইছিলাম, আমাদের গেছে যে দিন, তা একেবারেই যাক।

আবু দায়েন বলল, 'কবরের ওপর বেশ লাউ ফলেছে। বিক্রেতা কেউ থাকলে কেনা যেত'।

সত্যি, গোরস্থানের দক্ষিণ দিকটা ঘেষে বিশাল এক মাচায় বেশ সজীব, সতেজ ও প্রফুল্ল অজস্র লাউগাছ নিজেদের লাবণ্য ও সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিয়েছে। সবুজ বাদুড়ের মতো ঝুলে আছে এন্তার লাউ। সবই কচি। লাবণ্যময়।

সুমন সাজ্জাদ বলল, 'জৈব সার তো, তাই'।

দায়েন বলল, 'আমরাও একদিন জৈব সার হয়ে যাব'।

সুমন সাজ্জাদ বলল, 'তারপর লাউগাছ'।

কবরের ওপর লাউগাছের ব্যাপারটা আমার তেমন ভালো লাগল না। এর চেয়ে কয়েকটা অপরিজিতা বা নয়নতারা ফুটে থাকলেই ভালো হত। অথবা গন্ধরাজ বা কামিনী। কবরস্থান থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতেই দেখি, পাশেই গল্পের প্লট বিক্রির সাইন বোর্ড। লাল তিনটি তারা এঁকে বিশেষ দ্রষ্টব্যে লেখা আছে, একই সঙ্গে ধ্রুপদী ও জনপ্রিয় চারটা প্লট কিনলে একটা ফ্রি'। দোকানের প্রোপাইটারের নাম এম এ বাদল।

আবু দায়েন বলল, এম এ বলতে সে আসলে কী বোঝাতে চায় ? কোনো ঘর নেই, লোক নেই, এই বিজনে এই সাইনবোর্ড পুঁতে রাখারই বা কী মানে ? নাকি লোকটা এর মধ্যে কোনো প্রোডাকশন হাউসে যোগ দিয়েছে ?

সুমন সাজ্জাদ বলল, বা ঢুকে পড়েছে কোনো কবরে ? বা কেউ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

রায়হান ফিরে এসে বলল, 'ফোন করেছিল শহীদ কবীর, আমার অকাল-প্রয়াত বন্ধু, যে আত্মহত্যা করেছিল। ও এখন আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পাশে শুয়ে আছে, ঠনঠনাইয়া গোরস্থানে। ভালোই আছে। দুজনই কবি বা দুজনই গল্পকার হলে সমস্যা ছিল।'

আমি বললাম, 'মোবাইলে এতক্ষণ কী কথা বলল?'

রায়হান রাইন বলল, 'আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কি, যার কাছে ফোন করবে, সে কবর ঘেষে দাঁড়ালে ওদের নাকি মোবাইলের বিল দিতে হয় না। তা-ছাড়া, ওর বলার মতো অনেক কথা এখনো বাকি আছে। ফোনে তো আর সব বলা যায় না। আবার করবে।'

ভেতর থেকে খুঁড়ে খুঁড়ে, অনেকটা উল্টা-সিঁদ কাটার মতো, একটা কবর থেকে ইঁদুরের মতো করে বেরিয়ে এল এক লোক। কাঁদে একটা বাঁক। একদিকে ভাঙা শিশি-বোতল, প্লাস্টিকের নানা রকমের কৌটো, অন্য দিকে ধুলোবালুতে ঘোলাটে হয়ে-যাওয়া পলিথিনের একটা বড় বস্তা। মানে লোকটা ফেরিওয়ালা বা ছদ্মবেশী ফেরারী। মুখ তুলতেই লোকটা আমাদের দেখতে পেল কিন্তু এতে তার কোনো ভাবান্তর হল না। বরং আমাদের সামনে এসে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে দাঁড়ালো এবং তার বস্তাটি খুলে আমাদের একটি করে সাগুদানার চিপস্ দিল। দেখতে প্লেট বা আনআইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্টের মতো। দীর্ঘ পথযাত্রার পর আমরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই আমরা হাতে দেওয়া-মাত্র খেতে শুরু করলাম। অফ-হোয়াইট কালার, হাল্কা গরম, মচমচে ও সুস্বাদু।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কত?'

'গৌতমবুদ্ধের জন্মের তিন শ বছর আগে আশ্বিনের এক অমাবশ্যার রাতে আমার জন্ম। সে রাতে খুব ঝড় হয়েছিল, রজনীগন্ধা বনে। আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে মায়ের মৃত্যু হয়। এখন আপনারাই হিসেব করে নেন।'

আবু দায়েন বলল, 'তোমার বয়স জানতে চায়নি, দাম জানতে চেয়েছে। কত?'

'দাম ? কিসের দাম, বলেন। গৌতম বুদ্ধের, অমাবশ্যা রাতের, আমার জন্মের, আশ্বিন-রাত্রির ঝড়ের না আমার মায়ের মৃত্যুর?'

আবু দায়েন বিরক্ত হল। বলল, 'যে-খাদ্যবস্তু তুমি আমাদের প্রদান করলে, আর আমরা গপাগপ ভক্ষণ করলাম, তার দাম।'

লোকটা বলল, 'যে যেমন দেয়। পারস্যের বাদশাহ হারুন উর রশিদ দিয়েছিলেন পোখরাজ-খচিত হীরের হার, আর কবি আলাওল দিয়েছিলেন একটি পান্ডুলিপি। কেউ দেয় আশীর্বচন, আবার অনেকে কিছু দেয়ও না। এই দেখেন।'

সে তার কাঁধের ঝোলা থেকে বের করল কবি আলাওল প্রদত্ত পান্ডুলিপি। উপরে-নিচে চন্দকাঠের তক্তা-আবরণ। দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্থ অল্প। মাঝখানে ফুঁটো করে বাঁশের শলা দিয়ে আটকানো। তুলট কাগজের লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

প্রথম আর শেষদিকের অনেক পৃষ্ঠা নেই। এই লিপির সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই, তাই বোঝা সম্ভব নয়। আমাদের সহকর্মী খন্দকার মুজাম্মিল হক থাকলে পড়তে পারতেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি। কিন্তু গত ১১ই মে তাঁর তৃতীয় মৃত্যু-বার্ষিকী অতিক্রান্ত হয়েছে। তাঁকে কবর দেয়া হয়েছে পানধোয়া। পাণ্ডুলিপিটি দেখে আমাদের ভেতরে একটা সম্ভ্রমের ভাব জেগে উঠল।

লোকটা বলল, 'কারো অসুখ-বিসুখ করলে এই কাগজের একটু ভিজিয়ে খাওয়ালে সেরে যায়। পুরা পৃষ্ঠা ভিজিয়ে খেলে অমরত্ব লাভ করা যায়। উপকার করতে গিয়ে এটার এই হাল। এখন আর কাউকে দিই না। তবে অমরত্ব খুব আনন্দের ব্যাপার নয়।'

সুমন সাজ্জাদ বলল, 'এই তাহলে তোমার অমরত্বের গোপন রহস্য।'

আকস্মিক ও অবান্তরভাবে আবির্ভূত এরকম কাউকে বেশিক্ষণ সহ্য করা করা সম্ভব নয়। কারণ এরপর সে হারুন উর রশিদ প্রদত্ত পোখরাজ-খচিত হারটাও দেখাল। এটাও মনে হল নির্ভেজাল। আমাদের গা ছমছম করে উঠল।

আমি পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে দেখি, একটিও টাকা নেই। সব নানা আকৃতির দেবদারুপাতা। আমি একটি পাতা বের করে তার হাতে দিলাম। লোকটা খুব যত্নের সঙ্গে পাতাটা ভাঁজ করে ধূসর ফতুয়ার বুকপকেটে রেখে দিল। তারপর কোমরে গুঁজে-রাখা ময়ূরকণ্ঠী রঙের একটি মখমলের ছোট্ট থলে বের করে আমাকে কয়েকটি মোহর দিল। মানে আমার যতটুকু ফেরত প্রাপ্য। মোহরগুলো বেশ ছোট, তবে পুরু। যৎসামান্য আঁকিবুকিও আছে। হায়ারোগ্লিফিক কী-না কে জানে ! প্রাচীন মুদ্রার লিপি নিয়ে কাজ করেছেন এ কে এম শাহনাওয়াজ। কিন্তু আমরা এ-বিষয়ে বকলম।

রায়হান বলল, 'ভালোই হল, এগুলো দিয়ে আমরা নৌকায় ওপার যেতে পারব।'

সুমন সাজ্জাদ বলল, 'মানে, শেষ-পারানির কড়ি?'

আমার মনে হল, নিশ্চয় লোকটার হিসেবে কোনো গন্ডগোল হয়েছে। এইসব মূল্যবান মোহর আমার প্রাপ্য নয়। লোকটা রওনা দিয়েছিল, আমি ডেকে মোহরগুলো তাকে ফেরত দিলাম। লোকটা মোহরগুলো ফেরত নিল, এবং মৃদু হাসল, যার মানে, সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে, যদিও আমি জানি এর মধ্যে কোনো ব্যাপার-ট্যাপার নেই।

গা ছমছমানো শেষ করে আমরা অনেকটা পথ হেঁটে কর্দমাক্ত নদীরপারে এলাম। কে যেন রাস্তাটা গোবর-মেশানো মাটি দিয়ে লেপে রেখেছে। যেন কোনো গৃহস্থবাড়ির নিকোনো উঠোন।

ঘাটে তিনটি নৌকা। মাঝখানেরটা বেশ বড় এবং রঙিন কাপড় ও কাগজের কুচি দিয়ে সাজানো। ছাউনি আছে। কিন্তু সেটাতে কোনো লোকজন নেই। দুই পাশের নৌকা থেকেই আমাদের ডাকতে থাকল। কিন্তু আমরা মাঝখানের নৌকাটাকেই পছন্দ করলাম। শুনে ওরা হাসল। একজন বলল, আপনাদের কি ডেথ সার্টিফিকেট আছে ? এই নৌকায় শুধু মৃতরাই চলাচল করতে পারে।

রায়হান রাইন বলল, ব্রিটিশ উপনিবেশের দাপট দেখেছেন, এই মাঝি ইংরেজী বলছে।

আমরা সব পকেট তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন ডেথ সার্টিফিকেট পেলাম না। তাই ডান দিকের নৌকায় গিয়ে উঠলাম।

রায়হান রাইন বলল, এবার একটা সিগারেট খাওয়া যেতে পারে।

আমি ভেবেছিলাম ও বলবে, 'বেঁচে থাকাটা মাঝেমধ্যে বেশ দুঃখজনক।'

আমিও একটা ধরালাম। বেশ লাগছে।

আবু দায়েন জিজ্ঞেস করল, নৌকা কখন ছাড়বে ?

নৌকায় যারা ধীরস্থিরভাবে বসেছিল, তাদের একজন গা না-লাগিয়ে বলল, চারটা বিশে।

আমরা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, চারটা বিশ অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে।

২. জলে একটা কুকুরের মাথা ভাসছিল

খানিক বাদে নৌকাটা ছেড়ে দিল। নৌকা মানে শ্যালো বোট। আমরা চালককে জানালাম যে আমরা নদীর ওপার নেমে যাব। নদীর ওপারটা সত্যি শীতশূন্য পৌষের বৈকালিক আলোয় অদ্ভুত মায়াময় লাগছিল। গাছগাছালি কালচে-সবুজ একটা ঘনরেখার মতো পড়ে ছিল। চিত্রকলার একজন ছাত্রী, যে বরোদা থেকে আর্ট হিস্ট্রির ওপর মাস্টার্স করে এসেছে, আমাকে একটা স্কেচবুক, কিছু পেন্সিল, অনেক জলরঙের টিউব ইত্যাদি দিয়েছিল, বেশ কমাস আগে। এখন মনে পড়ল। নিয়ে এলে ভালোই হত।

ইন্‌জিনের কান-ফাটানো আওয়াজের মধ্যে নৌকার চালক বলল, 'ওপারে নামা যায় না'।

আবু দায়েন বললো, 'এ কি হাস্যকর কথা ! ওপার নামা যায় না, মানে কী ?'

আমি বললাম, 'উত্তেজনা প্রশমন কর।'

কোথাও কোন ভুল হয়েছে মনে করে রায়হান রাইন নৌকার চালককে বুঝিয়ে বলল, 'আমরা এ-নদীটার ওইপারে যেতে চাই। আমরা ওপার নামব।'

লোকটি নির্লিপ্ত কণ্ঠে জানাল, 'ও পার এ নৌকা যায় না। ও-নৌকা যায়। কিন্তু আপনাদের তো ডেথ সার্টিফিকেট নেই।'

আমি বললাম, 'বাদ দাও। সব পারই এক।'

রায়হান রাইন বলল, 'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

ইন্‌জিনের আওয়াজটা ভারি বিদ্‌ঘুটে। অল্প সময়ের ব্যবধানে তা আমাদের সহ্যসীমার মধ্যে ঢুকে গেল। আমরা দূরবর্তী ওপারের দৃশ্য দেখতে শুরু করলাম। সুন্দর ও রহস্যময়। হয়তো যে কোন সুন্দরই রহস্যময়।

সুমন সাজ্জাদ বলল, 'দেখেন তিনটা কুকুর।'

নদীজলের খুব কাছে একটা কুকুর সামনে পা বিছিয়ে উদাসভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা কুকুর অল্প একটু জায়গা জুড়ে ছুটোছুটি করছিল। আরেকটা ঘেউ ঘেউ করছিল।

আবু দায়েন বলল, 'মনে হচ্ছে আমাদের ডাকছে।'

রায়হান রাইন সায় দিল, 'কিন্তু ভাষাটা একটু অন্য-রকম। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে ধ্বনিগুলো পরিচিত ঠেকছে। হয়তো আবু দায়েনের কথাই ঠিক। আমাদের ডাকছে। কিন্তু কী লাভ !'

আমি নৌকার চালককে বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'কুকুরগুলো আমাদের ডাকছে। না-গেলে ওরা খুব মাইন্ড করবে।'

লোকটা আমার কথাকে কোনো গুরুত্ব দিল না। মনে হয় জানেই না ভদ্রলোকদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়। কেবল আনুনাসিক একটি আওয়াজ শুনলাম, 'হুঁ'।

আবু দায়েন বলল, 'কুকুররা খুব কামেল প্রাণী।'

সুমন সাজ্জাদ হঠাৎ চিৎকার করে বলল, 'মাঝখানের কুকুরটাকে আমি চিনতে পেরেছি। আজ থেকে প্রায় ষোল বছর আগে আমি একে নদীতে ডুবে যেতে দেখেছিলাম। অনেকের চোখের সামনে নদীতে নেমে একটা ডুব দিল। আর ভেসে ওঠেনি। ব্যাপারটা আমার সঙ্গে অনেকেই খেয়াল করেছিল।'

আবু দায়েন বলল, ব্যাপারটির কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা কি তুমি পেয়েছিলে?

সুমন সাজ্জাদ বলল, 'সবাই ভেবেছে, কুকুরটি আত্মহত্যা করল।'

রায়হান রাইন বললো, 'অনেক প্রাণীর মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা আছে।'

দায়েন খুব গম্ভীরভাবে ওপারের প্রকৃতি দেখতে দেখতে বললো, 'আমি ভেবে পাই না, এত সুন্দর সব জায়গা থাকতে সবাই কেন শ্যুটিং করার জন্য হোতাপাড়া ছোটে ?'

আমি ভাবলাম, হোতাপাড়া আবার কোথায় ? পৃথিবীতে কত জায়গাই যে আছে ! আবার কত জায়গাই যে নেই।

একটা জায়গা দেখলাম অদ্ভুত। নদীর পার থেকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলি শূন্যতা। কোনো বৃক্ষ তো দূরের কথা, একটা ঝোপ পর্যন্ত নেই। মুখ ঘুরাতেই দেখি, একটা কুকুরের মাথা জলের ওপর ভাসছে। এপার থেকে ওপার যাচ্ছে।

আবু দায়েন হঠাৎ কেঁদে ফেলল, 'একটা কুকুর যদি যেতে পারে, আমরা কেন ওপার যেতে পারব না ? আমরা কি গাঙ দিয়ে ভেসে এসেছি ?'

সুমন সাজ্জাদ বলল, 'অবশ্য আমরা এখন গাঙের ওপরই ভাসছি।'

আমি সান্ত্বনা দিলাম, 'কাঁদে না আবু দায়ান। একদিন আমরা নিশ্চয় ওপারটা দেখতে পারব।'

রায়হান রাইন বলল, 'এতটা নিশ্চিত হওয়া কি ঠিক ?'

আমি ওকে বাঁ চোখ টিপে ইশারা করলাম, যেন এ নিয়ে আর কথা না বাড়ায়। তারপর বললাম, 'আমি ভেবে পাচ্ছি না, এপারের লোকালয় রেখে কুকুরটা কেন ওপার যাচ্ছে। খাবার পাবে কোথায় ? আর এত বড় নদী, ও কি ওপার পৌঁছুতে পারবে ?'

সুমন সাজ্জাদ বলল, 'পাহাড়ের পাদদেশে তো আমার জন্ম, তাই আমি এখানে এলাম।'

আবু দায়েন বলল, 'একটা কথা বলে রাখা দরকার। আমি কিন্তু কাঁদিনি। কেবল আমার চোখে একটু পানি এসে গিয়েছিল। আর কে না জানে, কাঁদলে চোখ পরিষ্কার হয়।'

আমরা সবাই ওর কথায় সায় দিলাম। রায়হান রাইন বলল, 'তুমি কখনো কাঁদতে পার না। কেউ কখনো কাঁদতে পারে না। পারে কেবল চোখ পরিষ্কার করতে। আমাদের সবারই উচিৎ মাঝেমধ্যে চোখ পরিষ্কার করা।'

ওপার থেকে আমরা দৃষ্টি এপারে ফিরিয়ে আনলাম। আলো দ্রুত কমে যাচ্ছিল। দূরের একটা গাছ দেখিয়ে সুমন সাজ্জাদ বলল, 'ওটা কী গাছ ?'

আমি বললাম, 'সপ্তপর্ণী।'

'আর পাখিগুলো ?'

'খঞ্জনা।'

'এই প্রথম দেখলাম।'

রায়হান রাইন বলল, 'প্রথমও হতে পারে, শেষও হতে পারে।'

আমি বললাম, 'অশেষও হতে পারে।'

সুমন সাজ্জাদ বলল, 'লোকগুলো সবার ভাড়া নিল, আমাদেরটা নিল না। আমাদের কী ভেবেছে ?'

আবু দায়েন বলল, 'নেবে, নেবে !'

রায়হান রাইন বলল, 'সুদাসলেই হয় তো নেবে। যার যা পাওনা, তা সে ঠিকই আদায় করে নেয়।'

আমি ভাবলাম, সবাই কি পারে ? সবাই পারে না। যে ভাড়া নিচ্ছিল তাকে ডাকলাম, 'ভাড়া কত ?'

'যা ইচ্ছা দেন।'

আমি বললাম, 'আমার পকেটে শুধু কয়েকটি দেবদারু পাতা আছে। তরতাজা, ঘন-সবুজ।'

'দেন।'

আমি ওয়ালেট খুলতেই দেবদারুপাতার গন্ধ মৌ মৌ করে উঠল। আমি ভালো দেখে একটা দেবদারুপাতা তার হাতে দিলাম। লোকটা নাকের কাছে নিয়ে ঘ্রাণ শুঁকল, বলল, 'ঠিক আছে।'

আমি ভয় পাচ্ছিলাম, সে-ও কোনো মোহর-টোহর আমাকে ফেরত দেয় কী-না। না। চলে গেল। একটু পর একটা হোগলার বিছানা এনে পাটাতনে পেতে দিল। বলল, 'শুয়ে পড়েন।'

আমরা সম্মোহিতের মতো শুয়ে পড়লাম। মনে হয়, আমরা ক্লান্ত বোধ করছিলাম। এর মধ্যে দিনের সব আলো কখন ফুরিয়ে গেছে। পশ্চিম আকাশে মাখিয়ে-রাখা আবীরও নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমরা শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখতে থাকলাম। যেন আমরা একটি ডিমের খোলের ভেতর শুয়ে আছি। একটি তারা দেখিয়ে আবু দায়েন বলল, 'ওটা কি শুকতারা ?'

রায়হান রাইন বলল, 'শুকতারা মানে শুক্র গ্রহ।'

আমি বললাম, 'ওটা কোন্ দিক ?'

আবু দায়েন বলল, 'মনে হয় দক্ষিণ-পশ্চিম।'

আমি বললাম, 'তাহলে হতে পারে।'

সুমন সাজ্জাদ বলল, 'আমাদের তো দিকভ্রমও হতে পারে।'

আমি বললাম, 'তা পারে। আর হচ্ছে বলেই আমার ধারণা।' এর পর আর কোনো সংলাপ উচ্চারিত হল না। শুধু নিঃশ্বাসের শব্দ ক্রমাগত ভারী হতে থাকল। একসময় আকাশের সব তারা নিভে গেল। কিন্তু আকাশ ভরা অন্ধকার উপুড় হয়ে আমাদের দেখতে থাকল।

বা আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

বা আমরা অন্ধকারে মিশে গেলাম।

বা নিখিল-অন্ধকার আমাদের তার জরায়ুর প্রগাঢ় অন্ধকারে ফিরিয়ে নিল।